ভূমিকা

প্রাচীন মাহাকাব্যকেই উপন্যাসের পূর্বপুরুষ মনে করা হয়। বাস্তব জীবনকথা সব সময়েই পাঠককে আকৃষ্ট করে। উপন্যাস সমাজের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকে বলে তা হয় মানুষের বাস্তব জীবনের ছবি, বাংলা উপন্যাসে প্রথম দিকে ছিল নক্শা জাতীয় রচনা। এর যথার্থ সূচনাকাল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাস শাখায় গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অবস্থান করেছেন। তাঁর গল্প-উপন্যাসের আবেদন সাধারণ ও স্বাভাবিক, সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের সংঘর্ষ তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসের মূল উপজীব্য বিষয়। বিভিন্ন প্লটে ও তৎকালীন সমাজের নিরিখে উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন করেছেন তিনি। বিষয়কে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে সেই অনুযায়ী চরিত্র চিত্রণ করেছেন। উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলেই তৎকালীন সমাজের বেশ কিছু দিক স্পষ্ট হয়। আমার আলোচনায় সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে শরৎ উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণের প্রয়াস করব।

গুহাবাসী মানুষ থেকে শুরু করে আজও গল্পের প্রতি মানুষের চিরকালের আকর্ষণ। প্রথম দিকের রচনার বিষয়বস্তু ছিল হয়ত শিকার কাহিনী, হিংস্র দল-সংঘর্ষ, অন্য দলের স্ত্রীলোক চুরি ইত্যাদি। পরে শিক্ষা, সভ্যতা, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ফলে যুদ্ধবিগ্রহ, প্রেম-প্রণয় সাহিত্যে স্থান করে নেয়। এভাবে সাহিত্যে গদ্য আখ্যানের উৎপত্তি হয় এবং পরে যে সব অপরিণত গঠন গদ্যকাহিনী সুগঠিত হয়ে উপন্যাসে পরিণত হয়। ইতিহাসকে ঘিরেই হোক বা সমাজ-সমস্যা নিয়েই হোক নির্দিষ্ট প্লট ও চরিত্র চিত্রণের মধ্যে দিয়ে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করা হয়। ঘটনাবহুল কাহিনী, মিলনান্তক বা বিয়োগান্তক যাই হোক না কেন সব ব্যাপারেই বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হয় নারী-পুরুষের সম্পর্কের জটিলতা, সামাজিক নিয়ম, ধর্ম, সংঘাত ও দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে। উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি আধুনিক মানুষ নির্দিষ্ট শ্রেণীর বেড়াজাল ও সামাজিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ববোধকে তুলে ধরতে চায়। এই ব্যক্তিত্ববোধের সাথে সাথেই সৃষ্টি হয় উপন্যাস। বিশ্বাসযোগ্য কাহিনী থাকবে উপন্যাসের বিষয়বস্তুতে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে য়ুরোপের লেখক ও পাঠকেরা বুঝতে পারেন যে সামাজিক পরিমণ্ডলে যে বাস্তব মানুষের কাহিনী, চরিত্র ও চরিত্রঘটিত দ্বন্দ্বই হল উপন্যাসে মূল লক্ষণ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাসের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় সামাজিক নিয়ম-রীতি, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে দিয়েই চরিত্রগুলো আবর্তিত হয়েছে।

ইতালীয় শব্দ 'Novella' থেকে 'Novel' শব্দটি এসেছে। ইংরেজী সাহিত্যে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ, জার্মানির উইলেন্ড, গায়ঠে, ফরাসী দেশের মাদাম কোয়েত্তে, মারিওভোস প্রভোস-এঁরা

উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই ইংরেজী সাহিত্যে সমাজ ও পরিবারকে কেন্দ্র করে যুগান্তকারী উপন্যাস রচিত হয়। এরপর থেকেই সমাজ রাষ্ট্র পরিবেশ বদলাতে থাকে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিলতর হয়েছে, মনের মধ্যে জট পাকিয়েছে এবং য়ুরোপীয় উপন্যাসে সেই জটিলতা নানা ধরনের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। সেই ধারা বর্তমান কালেও বয়ে চলেছে।

মূলত ইংরেজী উপন্যাসের প্রভাবেই বাংলা উপন্যাসের উৎপত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখা হয়। বাংলা সাহিত্য শাখায় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই উপন্যাসের প্রসার ঘটেছে। প্যারিচাঁদ মিত্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাস জাতীয় রচনার গোড়াপত্তন করলেও যথার্থ উপন্যাস রচনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম প্রথমনাথ শর্মা। তাঁর রচিত 'নববাবুবিলাশ' (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ) প্রথম উপন্যাসের দাবি করে। এর ৩৫ বছর পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করা হয়। এটি প্যারিচাঁদ মিত্রের লেখা। এরপর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' বইটি লেখা হয় ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। এই তিনটি উপন্যাস-কল্প গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের বাবুচরিত্র ও বাবুপ্রসূত সমাজজীবন আলোচিত হয়েছে। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথারিন ম্যালেন্স রচনা করেন 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'। এই গ্রন্থটি সর্বপ্রথম জীবনের গভীর সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি, জীবনের সুমিত নীতি-নিয়ন্ত্রণ, দুষ্প্রবৃত্তি উন্মূলন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত। এর পরবর্তী পর্যায়ে রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান লক্ষ করা যায়। বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রমেশচন্দ্র দত্ত থেকে তা চোখে পড়ে। এই উপন্যাসগুলিতে দুটি প্রধান পরিবর্তন স্পষ্ট। প্রথমত, ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম সূচনা ও পরিণতি। দ্বিতীয়ত, বাস্তবতা প্রধান সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের মধ্যে এক গভীরতা ও ভাবসমৃদ্ধির সম্ভার। দৃষ্টান্তস্বরূপ রমেশচন্দ্রের লিখিত 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৫), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এসবের নাম করা যায়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বাংলা উপন্যাসের সার্থক সৃষ্টি।

বঙ্কিমের পর বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নতুন যুগের অগ্রগামী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামটি স্বর্ণাক্ষরে খোদিত রয়েছে। তাঁর রচনাতেই গভীরতর বাস্তবতা পরিণতি পায়। জীবনের সহজধারা অনুসরণ করেছেন তিনি, স্বাভাবিক কারণে জীবনে যেসব বিভেদের সৃষ্টি হয় সেগুলোকেই আপন দৃষ্টিতে তিনি তুলে ধরেছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ভারতী পত্রিকায় ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। যদিও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হয়নি। রবিঠাকুর ইতিহাসকে আশ্রয় করে কাহিনীকে বস্তুভিত্তিক কল্পনার জগতে আনলেন। রচনা করলেন 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ)। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সৃষ্টি প্রতিভায় এক নতুন দিক যোগ হয় 'চোখের বালি' (১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ) উপন্যাসে। ধারাবাহিকভাবে বঙ্গদর্শনে ১৩০৮-১৩০৯ বঙ্গাব্দে লেখা হয়। পরে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে। উপন্যাসটিতে বর্ণিত হয়েছে মহেন্দ্র, আশা, বিহারী ও বিনোদিনী— দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রী লোকের জীবনের সমস্যা। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে বিধবা, সুন্দরী, যুবতী নারীর প্রেম প্রবৃত্তির দাহ ও দীপ্তিকে স্বাভাবিকভাবে অনায়াসে তুলে ধরেছেন। বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম প্রবৃত্তি নিরোধের নিয়মে নারী নিয়ন্ত্রিত হল না। বলা হয় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এক অসাধারণ শিল্পকর্ম এবং বাংলা উপন্যাসে নতুন দিক নির্দেশক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাহিনী গ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রনে যে প্রভাবিত হয়েছিলেন তা তাঁর লেখায় স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। সাহিত্যে ঐতিহ্যের দিক থেকে শরৎচন্দ্র প্রথম দিকে অনেকটা বঙ্কিম অনুসারী, তবে তিনি উপন্যাসে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবপ্রেরণা ও উপস্থাপনা রীতির পথিকৃৎ। শরৎচন্দ্র বঙ্গদেশের নিতান্ত সাধারণ মানুষের মলিন ও তুচ্ছ জীবনকেই উপন্যাসের বিষয়বস্তুর উপাদান হিসাবে নিয়েছেন। ''আমাকে নিতে হলে ভালোমন্দ সব জড়িয়ে নিতে হবে। আমি তোমাদের মত পালিশ করা ভদ্রলোক নই''— এই যেন শরৎচন্দ্রের মানোভাব, লঘুতে এবং গভীরে ভরা শরৎচন্দ্রের জীবন সমস্তকে জড়িয়ে রয়েছে ছন্নছাড়া বাউণ্ডুলের উজ্জ্বলতা।

শরৎচন্দ্রের বেশিরভাগ গল্প উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে গ্রাম-অঞ্চল— বঙ্গের পল্লীজীবন ও পল্লীসমাজের চিত্র তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। এই পরিবেশের সাথে তিনি আশৈশব পরিচিত। তাঁর আঠার বছর বয়স পর্যন্ত অধিকাংশ সময় কেটেছে দেবানন্দপুরের পল্লী পরিবেশে। পল্লীসমাজ, পল্লীর মানুষের সুখ-দুঃখ ও সমস্যা তাঁর সংবেদনশীল কিশোর মনে প্রভাব ফেলেছিল। এছাড়াও গ্রামে গ্রামে ঘুরে সকল সম্প্রদায়ের নরনারীর সংস্পর্শে আসার ও তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল।

শরৎচন্দ্র ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান। ব্রাহ্মণের সেই বহুদিন সঞ্চিত সংস্কার তাঁর রক্তের মধ্যে ছিল। সচেতন বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে বিচার করেও তা অস্বীকার করতে পারেননি। তিনি স্পষ্টভাবে বাংলার এই পল্লীসমাজের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন—

''যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়, বিবাহে

যে, ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে, কাজে কর্মে হাতে পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধশান্তি করিতে হয়, উৎসব ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়— আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি ...।" সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের ধারণা ছিল— ভুলত্রুটি অন্যায় অবিচার সত্ত্বেও সমাজকে মানতেই হবে।

বাঙালি চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য হৃদয়বত্তা যা— শরৎচন্দ্রের মধ্যে ছিল। বাঙালির হৃদয়কে তিনি হৃদয় দিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন। এক সুগভীর সচেতন সমাজবোধে উদ্দীপ্ত মনের মানুষ ছিলেন শরৎচন্দ্র। জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে তিনি মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে এক নতুন চেতনা লাভ করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মানুষের সত্যকার মূল্য নির্ধারণে সামাজিক মানদণ্ড সর্বদা নিখুঁত ও নির্ভুল নয়। শরৎচন্দ্র তৎকালীন সমাজে যে সব বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন এবং যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন সেই পরিমণ্ডলে উপন্যাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। ব্যক্তি মানুষের জীবনে সামাজিক রীতি-নিয়ম, ধর্ম ইত্যাদি কীভাবে প্রভাব ফেলেছে ও তার পরিণাম তুলে ধরেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে যে আলোকবর্তিকা প্রজ্জ্বলিত করতে চেয়েছেন তা হল অতি সাধারণ নর-নারীদের বিচিত্র মানবিক আবেগ, অর্থনৈতিক প্রতিকুলতার সঙ্গে সংগ্রাম, সূচীবায়ুগ্রস্থ সমাজে তথাকথিত মূল্যবোধের বিপরীত স্রোতের অভিমুখে মৌন প্রতিবাদ হিসেবে। তাঁর উপন্যাসের একটি বিশেষ বিষয় নারী ও পুরুষের প্রেম, সেই সঙ্গে সমাজ ও সময় পরিপ্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান চিহ্নিত করা।

বাস্তব জীবনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বহু নারীর সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে নিয়েই লিখেছেন যেসব গল্প ও উপন্যাস সেসব কালজয়ী হয়ে বিরাজ করছে সাহিত্যাঙ্গনে। তাই তাঁর নারী-অন্বেষণ সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন উপলব্ধি করি। শরৎচন্দ্রের রচিত উপন্যাসের নারী চরিত্র বিশ্লেষণ করে সেই সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান অন্বেষণের চেষ্টা করেছি।

লেখক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, সমাজে নারীরা সব সময় উপেক্ষিত ও অবহেলিত; পরাধীনতা এবং কুসংস্কারের অন্ধকারে তারা ডুবে থাকে। পুরুষতান্ত্রিক সামজ ব্যবস্থায় এরা নিজেদের ব্যাপারে কিছু চিন্তা করা বা সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম। যে সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে পুরুষের ভোগবস্তু হিসাবে ভাবা হত, সমাজের নিয়ম ও শাস্ত্রবিধির এতটুকু মাত্র বেচাল হলেই তার চরিত্রে কলঙ্কের কালি মাখিয়ে দেওয়া হত। 'কুলটা' হিসাবে তাকে কোণঠাসা হয়েই থাকতে হত তাকে। নারীদের দাপট অতি সহজেই দমিয়ে দেওয়া হত। তাদের কলঙ্কিত, হীন দেখাতে কুলটা, বাঁজা,

চরিত্রহীন বলা হত।

আবার দেখা যায় নারীর মনও সমাজ ধর্ম ও সংস্কারের আবহেই আবর্তিত হত। মেয়েদের বিয়ে হওয়া ও সন্তান ধারণ জীবনের প্রধান দিক বলেই মনে করে। মা না হতে পারাও তার জীবনের বড় কষ্ট। এই অক্ষমতার জন্যে সে দায়ী। নিজের জীবনকে ব্যর্থ বলে মনে করে। নারীর জীবন সমাজ ও সংস্কারকে নিয়েই চলতে থাকে। কৈশোরে পিতা-মাতা, ভাই-বোন সহ পরিবারের সবার প্রতি মমত্ববোধ, যৌবনে কোন একজন পুরুষকে ভালোবেসে মনের সুখ, দাম্পত্য জীবনে স্বামীসুখ ও সন্তান আকাঙ্ক্ষা। এসবের একটি থেকে বঞ্চিত হলেই নারী সুখী হয় না।

নারীর পরকীয়া প্রেমকে বিষয় করে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসেও পরকীয়া প্রেম তথা সমাজ অননুমোদিত প্রেমের কথা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝেছিলেন সমাজে নারীরা অবহেলিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত; পরাধীনতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। হয়ত এ জন্যেই মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে পরকীয়া প্রেমের প্রকাশ হয়েছে।

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী-মনের সংঘাত ধরা পড়েছে। দুটি বিষয়কে কেন্দ্র করে এই সংঘাত— তার একটি স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ, আর অপরটি বংশ পরম্পরায় চলে আসা সংস্কারের শক্ত প্রাচীর। এই সংস্কারের গণ্ডী পার হতে না পেরে বহু নারীর চোখের জলে বুক ভেসে গেছে। কেউ কেউ বা দুঃসাহস দেখিয়ে এই সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করে গণ্ডী পার হয়েছেন।

সমাজ সম্পর্কে লেখক মত প্রকাশ করে বলেছেন— ভুলত্রুটি অন্যায় অবিচার সত্ত্বেও সমাজকে মানতেই হবে। এদেশের নারীরা বিয়ের পূর্বে যাই ভাবুক না কেন, বিয়ের পরে স্বামী ছাড়া অন্য কাউকে মনে স্থান দিতে পারে না। স্বামী-লম্পট, মাতাল দুবৃত্ত হলেও স্বামীর অনুগামী হওয়াই আদর্শ স্ত্রীর কর্তব্য। এই সনাতন আদর্শকে মনে রেখেই শরৎচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। লেখক বঙ্গসন্তান বলেই বঙ্গভূমি ও বাঙালি নারীর কথা তাঁর কলমে উঠে এসেছে। তিনি সব নারীর বেদনাগুলি মনের গহন থেকে তুলে এনে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন, দরদী মন নিয়ে সেগুলি বর্ণনা করেছেন। শরৎ উপন্যাসে দক্ষতার সঙ্গে যে সব নারীর জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে তারা প্রায় প্রত্যেকেই পরস্পর বিপরীত আবেশে স্পন্দিত হয়েছে। এর মধ্যে বেশির ভাগ নারী অতৃপ্ত প্রেমের বহ্নিজ্বালায় দগ্ধ হয়েছে। শরৎচন্দ্রের লেখায় খুব কম নারীকে সুখী হতে দেখা গেছে। তবে 'চন্দ্রনাথ', 'নববিধান' এবং ' পরিণীতা'-য় শেষে মিলন হয়েছে।

লেখক শরৎচন্দ্র তাঁর রচিত বেশ কিছু উপন্যাসে, হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার, সংকীর্ণতা,

ক্ষমাহীনতার উল্লেখ করেছেন। ধর্মীয় নিষ্ঠার কথাও লিখেছেন কিছু উপন্যাসে। ধর্মীয় নিষ্ঠা কখনও কখনও মানুষের মধ্যে সাহস, তেজ ও মানসিক শক্তির উৎস হয়। 'বিপ্রদাস' ও 'নববিধান' উপন্যাসে যা লক্ষ করা যায়।

শরৎ-উপন্যাসের নারীরা প্রত্যেকেই এক একটি বিষয়ের প্রতীক রূপে বর্ণিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র বাস্তববাদী লেখক ছিলেন বলেই তাঁর জীবন চলার পথে যে সব নারীর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সেই নারীরাই উঠে এসেছে তাঁর লেখায়। এই সব নারীদেরই তিনি গল্প ও উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রের রূপ দান করেছেন। সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ বিশেষত নারী জীবনের সুখ-দুঃখ, অশ্রু-বেদনাকে সহানুভূতির সঙ্গে উপন্যাসের মধ্যে মূর্ত করে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসে গ্রাম-সমাজ ও শহর-সমাজ দুই-ই আছে। আবার কাঙাল, গরীব অন্ত্যজশ্রেণীর মানুষ যেমন আছে, তেমনি ধনী জমিদার, জমিদার-কর্মচারী, উচ্চবর্ণের মানুষও তেমন আছে। শরৎচন্দ্র দৈনন্দিন পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেমের সম্পর্ক, দৈন্য-দুর্দশা, একান্তবর্তী পরিবারের সমস্যা-সংকট-বিপর্যয়ের মধ্যে নারীর যন্ত্রণা ও জীবন সংকটকে উপন্যাসের মধ্যে ব্যক্ত করেছেন। গ্রাম সমাজের দলাদলি, সমাজ-নিষিদ্ধ প্রেম, সতীত্বের মানদণ্ড নারীর উপরে চাপিয়ে দেওয়া নানা সংস্কার-প্রথা— এসব কিছু অপূর্ব দরদী মন নিয়ে উপন্যাসের আলেখ্য নির্মাণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের সমকালীন সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে উপন্যাসের নারী চরিত্রের অবস্থান নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছি। সমগ্র গবেষণা পরিকল্পনাকে ফলপ্রসূ করতে নিম্নলিখিতভাবে অধ্যায় বিভাজন করে প্রতিটি অধ্যায়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাবকে ব্যক্ত করতে চেয়েছি।

প্রথম অধ্যায় : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী ও সাহিত্য পরিচয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্য ও শ্রেণী বিভাজন।

তৃতীয় অধ্যায় : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার-ভিত্তিক উপন্যাসে সময় ও সমাজের প্রেক্ষিতে নারীর অবস্থান।

চতুর্থ অধ্যায় : সময় ও সমাজের নিরিখে সমাজ অননুমোদিত প্রেম সম্পর্কিত শরৎ উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণ।

পঞ্চম অধ্যায় : সময় ও সমাজের নিরিখে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক উপন্যাসে নারীর অবস্থান অন্বেষণ

উপসংহার :